দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

15

বাংলাদেশের গ্রন্থনীতি ঃ দু'একটি কথা

শামসুল হক

সরকার জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করছেন এবং এ উদ্দেশ্যে কমিটিও গঠন করেছেন, সংবাদটি আমাদের জন্য, যারা গ্রন্থজগতের সংগে জড়িত, অত্যন্ত আনন্দদায়ক নিঃসন্দেহে। এই পদক্ষেপটি এমন এক সময়ে সরকার নিলেন যখন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতই এ-ক্ষেত্রেও বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছে।

তিন শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ গ্রন্থের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঃ গ্রন্থকার, প্রকাশক ও পাঠক। গ্রন্থকার বই লেখেন পাঠক পড়েন বলে, আর পাঠক পড়েন বলে প্রকাশক তা ছাপিয়ে বার করেন। বস্তুত, এরা একে অন্যের পরিপূরক। অর্থাৎ পাঠক যদি বই না পড়েন, তবে প্রকাশক বই ছাপিয়ে বার করবেন না, আর প্রকাশক যদি বই ছাপিয়ে বার না করেন, তবে গ্রন্থকার বই লিখলেও তার আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা কম। মোট কথা, গ্রন্থজগতের এই যে ত্রিমুখী কর্মতৎপরতা, তা কিন্তু প্রধানতঃ পাঠককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। যা হোক, ৭১-পূর্ব আমলে প্রকাশনা শিল্পে আমরা মোটামুটি একটা সুশৃংখল অবস্থা লক্ষ্য করেছি এবং অন্য প্রসংগে না গিয়েও বলতে পারি, সে সময় সরকারের বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর ও রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশনস-এর অফিসের সংগে প্রকাশকদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তখন নিয়ম ছিল, যতদূর মনে পড়ে, যে-কোন বই বা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে দুই কপি জমা দিতে হতো ঐ অফিসে। আপত্তিকর তথ্য সম্বলিত কোন বই থাকলে রেজিস্ট্রার সে-বই সম্পর্কে তার মন্তামত সরকারের সমীপে পেশ করতেন। সরকার সে বই সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে পারতেন। রেজিস্ট্রার তারপর প্রাপ্ত বইয়ের যাবতীয় তথ্য, যথা-লেখক, বইয়ের নাম, প্রকাশক, ঠিকানা, দাম, পৃষ্ঠা ইত্যাদি সম্বলিত ক্যাটালগ তিন মাস অন্তর অন্তর গেজেটের সংগে প্রকাশ করতেন। প্রকাশককে আরও দুই কপি বই জমা দিতে হত জাতীয় গ্রন্থাগারে। তাদেরও ক্যাটালগ করার রীতি ছিল এবং বেশ কিছু ক্যাটালগও তারা প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায়। এই ক্যাটালগগুলো ভবিষ্যৎ গবেষণা কাজের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান বলে প্রমাণিত। উক্ত দুই প্রতিষ্ঠান গ্রন্থজগৎ সম্পর্কে মোটামুটি খবরাখবর রাখত এবং সরকারের সংগে যোগসূত্র রক্ষা করে চলত। এখনও আগের মতই হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়ত বা প্রকাশকের মাধ্যমে বই-পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানেও নিশ্চয়ই ঐসব কাজকর্ম চালু আছে এবং আমরা আশা করি উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় আগের মতই তাদের নির্ধারিত কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আর চালিয়ে যাওয়ার বেশি প্রয়োজন আছে এই জন্য যে, যদিও বর্তমানে কাগজ, কালি, বাইন্ডিং, ছাপা খরচ ইত্যাদি তুলনাতীতভাবে বেড়ে গেছে, তবু কিন্তু সংস্কৃতি চর্চায় এবং প্রকাশনা শিল্পে ভাটা পড়েনি বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর সংগে বৃদ্ধি পেয়েছে মুদ্রিত উপাদানও। এগুলোর সুশৃংখল তদারকির জন্যই তাদের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে মনে করি।

উল্লেখ্য, সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির আয়নাবিশেষ। সে জন্য সাহিত্যের ইতিহাস জাতির পরিচয়পত্র। এখানেই ফুটে ওঠে জাতির চেহারা। তাই সাহিত্যের যাদুঘরেই পাওয়া যায় জাতির অতীত দিনের আচার-আচরণ ও জীবনাচরণের চিত্র-বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য। রাষ্ট্রকে সুষ্ঠু ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে চালাবার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় নীতিমালা, যেমন- শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি (এর মধ্যে আবার আমদানি ও রফতানী নীতিও আছে), বিদেশনীতি ইত্যাদি অবশ্যই।

৮-এর পাতায় দেখুন

ইনকিলাব সাহিত্য

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

বাংলাদেশের গ্রন্থনীতি ঃ দু'একটি কথা

৭-এর পাতার পর

থাকতে হয়, তেমনি থাকা প্রয়োজন গ্রন্থনীতিও। গ্রন্থনীতির আলোকে পরিচালিত হওয়ার কথা আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও পরিমণ্ডল। কারণ, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা আমাদের চিৎপ্রকর্ষের ধারক ও বাহক। মানুষের জ্ঞানের পরিধি আজ এত পরিব্যাপ্ত যে, পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে নানা তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমে। আমরা প্রতিনিয়ত সংস্পর্শে আসছি পৃথিবীর নানা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের সঙ্গে। অনেক সময় আমরা প্রভাবিত হচ্ছি কোন না কোনভাবে। আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। এদের মধ্য থেকে ভাল জিনিসটিকে বেছে নিতে হয় আমাদের সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করবার জন্য। একতরফাভাবে আমরা শুধু নেবই না। আমাদের নীতি হতে হবে দেবার এবং নেবার- মিলবার এবং মেলাবার। কি ধরনের গ্রন্থ আমাদের আহরণ করতে হবে, তা অবিশ্যি নির্ভর করবে দেশের চাহিদা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা এবং মননচর্চার ওপর।

মতলবি আলোচনা বা পণ্ডিতি সংজ্ঞা নিরূপণের কচকচিতে না গিয়ে আমরা বলতে পারি, যে দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও আটপৌরে জীবন-চর্চা মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং পেয়ে আসছে এবং যা পরিবেশ-পরিমণ্ডল দ্বারা সমৃদ্ধ, তাই-ই সংস্কৃতি। ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণাকে বা রুচিকে যা বিকৃত করবার প্রয়াস পায় এবং সামাজিক মূল্যবোধকে টালমাটাল অবস্থায় ফেলতে চায়, তাকে অপসংস্কৃতির পঙ্‌ক্তিতে ফেলা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যা ভাল, সমাজের জন্য কল্যাণকর, তাও আমরা গ্রহণ করব না। এর জন্য চাই মনের সচেতন উদারতা এবং মনের দরজা খোলা রাখার মত দরাজ দিল। তবে আমরা যাই করি না কেন, তা যেন আমাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী না হয়, আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত ও পরীক্ষিত ধ্যান-ধারণার স্খলনে সৃষ্টি না হয়। নতুন যা আমরা গ্রহণ করব, তা হবে সংযোজন- আমাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য।

বলাবাহুল্য, আমাদের প্রাণরাঙা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, কৃষ্টীয় ইতিহাস আছে। এই ঐতিহ্য ভিতে ভিতে গড়ে উঠেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে। অতএব আমরা জোরের সাথে বলতে পারি, আমাদের সংস্কৃতি কোন ভুঁইফোঁড় বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংস্কৃতি নয়। আর এই সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এতই সমুজ্জ্বল যে, এর জন্য অন্যের কাছে হাত পাতার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ারও কারণ নেই। অন্যের পুচ্ছ ধার করে নিজেকে নকল ময়ূর বানাতে হবে, এমন মানসিকতাও আমাদের নেই। এ-ব্যাপারে আমাদের কোন হীনমন্যতা নেই। আমাদের যা আছে তাই-ই সাত রাজার ধন, অমূল্য রতন। এর প্রয়োজন শুধু সুষ্ঠু চর্চা ও সদ্ব্যবহার। ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ ব্যবহার একে বিশ্বের দরবারে আরও মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এতে মোটেও সন্দেহ নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রতিক কিছু ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার কারণে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনও হয়ে উঠছে ধোঁয়াটে এবং সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান। তাদের কল্যাণে সংস্কৃতি এখন অবাঞ্ছিত বিভ্রান্তির আবর্তে দিশেহারা প্রায়। একে এই ধোঁয়াটে অপচ্ছায়া থেকে উদ্ধার করে সুস্পষ্ট অবয়ব দান করা দরকার- প্রতিষ্ঠিত করা দরকার স্বরূপে ও স্বমহিমায়। আমাদের সংস্কৃতির বাহন যে ভাষা, তাও কিন্তু আমাদের একেবারে মায়ের ভাষা। ষড়যন্ত্রকারী ও চক্রান্তকারীরা একদা কেড়ে নিতে চেয়েছিল আমাদের মুখের ভাষা; কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরা তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। অতএব আমাদের ভাষার যে বাচনভঙ্গি তাও একান্ত আমাদেরই। সেজন্য আমাদের গর্ববোধও কম নয়। এতদঞ্চলের ভাষায় যে পৌরুষ এবং বলিষ্ঠতা, তা আমাদের চিরকালের সংগ্রামী চেতনার ধারক ও বাহক। এ ভাষায় যখন আমরা বাপ-ভাই কথা বলেন, তখন তাঁদের পৌরুষ-দীপ্ত দরাজ কণ্ঠ ও তাদের অকৃত্রিম উচ্চারণভঙ্গিও জানান দেয়, আমরা বেঁচে আছি এবং তা আমাদের সগৌরবে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। এ-ভাষা আমাদের গর্বের ধন। এজন্য আমরা হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছি এবং প্রয়োজনে যে-কোন সময় দিতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের যেমন কারও সাথে কোন আপোষ নেই, তেমনি নেই কোন হীনমন্যতা। আমাদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে যখন আপন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হওয়ার পরিবর্তে অক্ষম কৃত্রিম উচ্চারণে ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়াস পাই, তখন এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিদেশীরা আমাদের নিয়ে কৌতুকবোধ করেন এবং আমাদের হীনমন্যতায় করুণাবোধ করেন। এভাবে আমরা আমাদের নিজেদের এবং ভাষারই অপমান করি। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আমাদের সংস্কৃতি, যা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। কারও দয়াদাক্ষিণ্যে তা পাওয়া নয়। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত এ সংস্কৃতি এর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষের স্বাভাবিক প্রযত্নে এবং আমাদের অক্লান্ত পরিচর্যার পরশে। এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও পরিশীলিত চর্চাও তাই আমাদের ওপরই বর্তায়।

১৯৪৭-পরবর্তী সময় থেকে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আবর্তিত হচ্ছে ঢাকাকে কেন্দ্র করে। এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। আমাদের সাহিত্যে নতুন শৈলী, নতুন আঙ্গিক এবং এ অঞ্চলের ভাষার প্রয়োগরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং আমরা এর ইতিবাচক ফলও ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। বলাবাহুল্য, ভাষা ও সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো। এরা নিজেদের প্রয়োজনে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। চলার পথে কিছু অর্জন, আবার কিছু বর্জন করে এগিয়ে চলে। এ ক্ষেত্রে কারও নির্দেশ বা অনুশাসন সে মানে না। আপন প্রয়োজনই এদের কাছে বড় কথা। তবু দিক-নির্দেশনার জন্য কিছু নীতিমালা থাকতে হয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য। এর আগে গ্রন্থ সম্পর্কিত কোন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে কি-না আমাদের জানা নেই। দেরি হলেও বিষয়টির প্রতি সরকার যে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা তাদের সমাজ চেতনার পরিচয় বহন করে।

যাহোক, গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করার সময় আমাদের সংবিধানের মূলনীতি অনুসৃত হচ্ছে কি-না, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। যে-কোন দেশের জন্য গ্রন্থনীতি থাকা দরকার এবং আছেও। তবে এই নীতি বেশি দরকার কচি শিশু ও কিশোরদের জন্য। এদের মন থাকে মোমের মত নরম। আর সেই মনে ভাল-মন্দ উভয়েরই ছাপ পড়ে এবং তা তাদের জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। তাই এদের পাঠ্যসূচী নির্মাণে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজন। তাদের সামনে এমন সব উপাত্ত তুলে ধরতে হবে, যা তাদের সুনাগরিক করবে এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলবে। গ্রন্থনীতির মূল উদ্দেশ্যও হতে হবে এটাই। তাই শিক্ষানীতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক রিপোর্ট, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো গ্রন্থনীতি প্রণয়নে উপকারে আসতে পারে বলে আমাদের ধারণা। দেশের গ্রন্থাগারগুলো গ্রন্থনীতি প্রচার ও প্রসারে কি ভূমিকা পালন করতে পারে, সে বিষয়েও চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের তো মনে হয় গণশিক্ষা (বয়স্ক শিক্ষা), অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করে সেই নীতির বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত এবং এমন কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার যাতে করে বাইরের সংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিহত করার শক্তি অর্জন করা যায়। মোট কথা, জাতীয়তাবোধে সকল নাগরিককে, বিশেষ করে কোমলমতি ছাত্রদের উজ্জীবিত করাটাই হবে আমাদের মতে গ্রন্থনীতির মূল কাজ এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখে গ্রন্থনীতি প্রণয়নে সর্বচিন্তা প্রয়োগ করার প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ইনকিলাব সাহিত্য